প্রথম প্রকাশ : ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায় : বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ ▪ CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL ▪ NORTH AMERICA

Sangbad Bichitra - August 2026. Digital Version. Published by Cultural Association of Bengal, North America.

Editorial Board : Dilip Chakrabarti, Rupa Majumdar, Chitta Saha & Sudipta Chattopadhyay
Advisory Board : Dr. Amiya Banerjee & Mr. Asok Motayed

শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রয়াত শ্রীমতী ইলা দাস – আমাদের সকলের প্রিয় ইলা, ইলাদি অথবা ইলাবৌদি আর আমাদের মধ্যে নেই

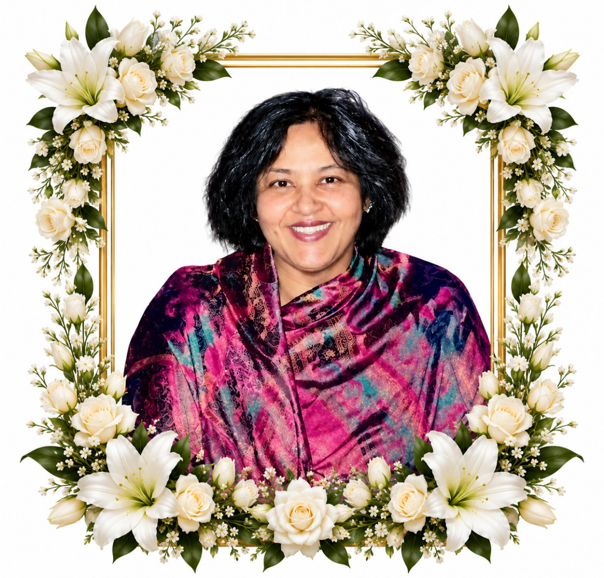

গভীর দুঃখের সাথে সকলের অবগতির জন্য প্রতিবেদন করছি যে আমাদের সি এ বির অতি প্রিয় শ্রীমতী ইলা দাস ইহলোক পরিত্যাগ করে ঈশ্বরধামে গমন করেছেন গত ২৫শে জুলাই, ২০২৬।

আজ আমরা সকলে ভাবতেও পারছি না যে আমাদের কারো ইলাদি, কারো ইলাবৌদি বা কারো বা ভগ্নীপ্রতিম ইলা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ব্যক্তিগত জীবনে ইলা ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় প্রণব দাসের সহধর্মিনী। আমরা সকলেই জানি প্রণব দাস নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সির একজন অতিদরদী সমাজসেবী ও সি এ বির প্রাক্তন সভাপতি, চেয়ারম্যান এবং বর্তমান বোর্ড অফ ট্রাষ্টীর একজন সক্রিয় সদস্য। কিন্তু এ দরদী মনপ্রাণের প্রাণভ্রমর ছিলেন আমাদের সকলের অতি প্রিয় ইলা দেবী। যাঁরাই এ সহজ সরল অতিথিবৎসল অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইলার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই ইলার ব্যক্তিত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর নির্ভীক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মননশীলতা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। ইলা তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। বিগত প্রায় এক দশক ধরে তিনি বৃক্করোগে(কিডনি) অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর অতিথিসেবার কোন ত্রুটি ছিল না, প্রতিনিয়ত যত্ন সহকারে সকলের তত্বাবধান করেছেন, এমন ত্রুটিহীন মমতার বহিঃপ্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নিউ ইয়র্ক নিউজার্সির প্রতিটি বাঙালি আগামী দিনে ইলার অভাব অনুভব করবে।

শ্রীমতী আরতি ও ভারতীয় কূটনীতিবিদ শ্রী নির্মল চন্দ্র কাঞ্জিলালের প্রথম কন্যা সন্তান ইলার জন্ম হয় কলকাতার গোলপার্কে ১৯৪৬ এর ২৫ শে জুলাই, কলকাতা তখন হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গায় জ্বলছিল, কলকাতায় তখন "কারফিউ" জারী করা হয়েছিল, সেজন্য পরিবারের অনেকেই আদর করে ওকে "কার্ফু" বলে ডাকত। দাঙ্গার আগুনের আঁচ যার জন্মলগ্নে সে তো তার অগ্নিবৎ ব্যক্তিত্ব দিয়ে মনুষ্যত্বকে প্রজ্জ্বলিত করবেই, ইলা এমনই এক ব্যতিক্রমী জ্বালামুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী ছিলেন যাঁর সত্যকে তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। এমন সাহসী মন সহসা দেখা যায় না।

শৈশবের অনেক সময় কেটেছে তার ভারতের বাইরে, বিশেষ করে অধুনা বাংলাদেশ ও ইউরোপের নেদারল্যান্ডসে। পরবর্তীকালে তাঁর পরিবার নিউ দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্কে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। "এলায়েন্স ফ্রান্স" স্কুলে পড়ার সময় ইলা ফরাসী ভাষা রপ্ত করে নেন। শিক্ষার পরবর্তী অধ্যায় শুরু হয় কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। তারপর আমেরিকার "উইসকনসিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে" এক সেমিস্টার কাটিয়ে "নিউ ইয়র্ক"বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বের সাথে জার্নালিজমএ মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করেন। নিউ ইয়র্ক শহরে ইলা ও প্রণবের আলাপ ১৯৭৬ এর মার্চে পরিণয়ে পরিণত হয়।

কর্মজীবনে ইলা নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। ইতিমধ্যে পুত্র অর্ণবের জন্ম হয়। প্রথমদিকে নিউ ইয়র্ক শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেন। পরে তাঁরা নিউজার্সির এডিসনে স্থিতু হন। পরে অবশ্য তাঁরা "স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের" গ্রাইম হিলসএ স্থায়ীভাবে

Executive Committee

Ashok Rakhit
President

Tapas Sanyal
Vice President

Indrasish Basuroychowdhury
Vice President

Biswa Bhattacharya
Vice President

Arpita Gupta
Treasurer

Partha S. Chakraborty
Secretary

Dipankar Chattopadhyay
Asst. Secretary

Committee Members

Amit Ganguly
Lipika Mukhopadhyay
Sarmistha Chakraborty (Babli)
Sudipta Chattopadhyay (Buya)
Biman Ghosh
Kris Ghosh (Bappa)
Prithviraj Banerjee
Rupa Majumdar
Tapan K. Das

Board of Trustees

Gopendu Chakrabarti
Chairperson

Trustee Members

Abhik Dasgupta
Amiya Banerjee
Dilip Chakrabarti
Kallol Chattopadhyay
Milan Awon
Partha S. Chatterjee
Pranab Das
Ranadeb Sarkar
Sugata Bagchi
Surajit Sengupta

Rules for submitting articles to Sangbad Bichitra

Submit only one text at a time in any one category.

Send articles to this email : sangbadbichitra5@gmail.com

1) Poems should be within 12-20 lines.
2) Short poems should be within 6-8 lines.
3) Short stories should be between 250-500 words.
4) Stories should be at least 1200 words but no more than 1500 words.
5) Essays/articles related to literature, science and social issues should be less than 500 (for an article) to 1000 (for an essay) words.
6) News form within your local community about art, culture, etc. should be within 100-500 words. Success stories of your next generation young members on any arena can be shared.
7) The text should be formatted in Avro font and stored as a MS Word (.docx) file. Handwritten content, an image (like JPEG or a PDF) file are not suitable formats and submissions will not be accepted.
8) Content should be previously unpublished and original.
9) Content should be free from typographical and grammatical errors.
10) Any content directly commenting on a political party, religion, caste, nation or a particular individual in a biased positive or negative manner will not be accepted for publication.

- Please understand that if the submitted content does not confirm to the guidelines set forth above (especially word limit), it will not be accepted for publication (due to space constraints of a 16-page magazine).

- This is a publication focused on community(ies) and our main aim is to publish news from any organization that promotes Bengali art and culture. As local Bengali organizations submit content to us, we will strive to publish items accordingly.

- Your opinion is important to us : Please provide your review (via email) of the contents of "Sangbad Bichitra" as it tackles pertinent subjects and viewpoints and their manner of presentation. If there is any room for improvement, please do not hesitate to describe them briefly and we shall publish your feedback in our subsequent edition.

Advertisement Rates for Sangbad Bichitra - 2025

(Color – Back Page)		1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page	(14 x10 inch)	$250	$1,500	$2,500
1/2 Page	(10 x 7 inch)	$150	$750	$1,250
1/4 Page	(5 x 4 inch)	$100	$500	$1,000
1/8 Page	(5 x 2 inch)	$50	$250	$500

(Color – Inside)		1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page	(14 x10 inch)	$150	$1,000	$2,000
1/2 Page	(10 x 7 inch)	$100	$500	$1,000
1/4 Page	(5 x 4 inch)	$75	$250	$500
1/8 Page	(5 x 2 inch)	$35	$150	$300

- Minimum three (3) issues.
- Payment is required in advance.
- Make check payable to : CAB
- Mail to : Cultural Association of Bengal
- Address : Arpita Gupta - Treasurer
  20, Cambridge Road, Lafayette NJ-07848, U.S.A
- Zelle to : 516-965-5277

বসবাস শুরু করেন। ২০০৪এ সিটির শিক্ষাবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করে ইলা তাঁর অবসর জীবন শুরু করেন।

ক্রমশঃ ইলার স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হয়, প্রায় চার দশক পূর্বে তিনি কিডনি সমস্যায় পীড়িত হন, ১৮ বৎসর পূর্বে ডায়ালিসিস শুরু হয়, এবং সাড়ে ষোল বৎসর পূর্বে সাফল্যের সাথে ইলার দেহে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিস্থাপনের পরে তিনি ভালই ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন “রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দমনকারী” ঔষধ (Immunosupressive Drug) গ্রহণ করার ফলে তাঁর ধমনীতে ক্যালসিয়াম জমতে শুরু করে। ধমনীতে “ক্যালসিফিকেসন” হলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পার। সম্প্রতি ইলাদেবীর শারীরিক অবনতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা পুত্র অর্ণবের কাছাকাছি মেসাপেকোয়াতে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু ক্রমশঃ ইলার স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হয় এবং অবশেষে ২০২৬এর ২৫শে জুলাই ইহলোকের বন্ধন ছিন্ন করে ঁঈশ্বরের শ্রীচরণে নিজেক সমর্পন করেন। ঈশ্বরের কৃপায় ইলাদেবী সপরিবারে তার জীবন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন, বিশেষ করে তাঁর নাতিনাতনিদের সাথে। ইলাদেবী চলে গেলেন কিন্তু তিনি আমাদের দেখিয়ে গেলেন কি ভাবে মানুষকে ভালোবেসেও জীবন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। তিনি দেখালেন – জীবনের অপর নাম মনুষ্যসেবা।

তিনি রেখে গেলেন পতি প্রণব, পুত্র অর্ণব ও পুত্রবধু , পৌত্র দেবেন, পৌত্রী আলিয়া ও লীলাকে। আর রেখে গেলেন তিন ভ্রাতা এক ভগ্নী এবং তাদের সকলের পতি পত্নীদের ও তাদের সন্তানসন্ততিদের। তার সাথে রেখে গেলেন কানেক্টিকাট, নিউ ইয়র্ক ও নিউজার্সির অগণিত বন্ধুপরিজন ও গুণগ্রাহীদের। ইলার দেবীর প্রয়ান শুধু পরিবারের ক্ষতি নয়, এ ক্ষতি সকলের যারা ইলার সান্নিধ্যে এসেছিলেন বা আসেননি, এ ক্ষতি সি এ বির ক্ষতি, তথা আমেরিকায় বসবাসকারী সকল প্রবাসী বাঙালির অপূরণীয় ক্ষতি। পরমপিতার কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনা – তোমার শ্রীচরণে ইলাকে চিরসুখেনিমজ্জিত রেখো।

Remembering Mrs. Ila Das

August 2026

Mrs. Ila Das with the members of Street Children International-April 2019

I'm honored to share some of my memories of Ila Das during our years of interaction.

I met Ila-di at a cultural program soon after I moved to New York about 20 years ago. She was one of the few people I came into contact with from the Bengali community. During our first meeting, she enthusiastically narrated some of her recollections of Delhi, and we instantly formed a special connection because of our common experiences of my own life in Delhi.

We continued that bond in the years that followed. As a newcomer in New York, I was immediately drawn to Ila-di's warm, welcoming personality and very soon she became a friend and a mentor in my new environment. Ila-di introduced me to the members of Street Children International and encouraged me to come to the organization's meeting. Her dedication to the organization and her sincere commitment inspired my family. My daughter and I soon began to participate in the meetings and events in order to engage in the organization's mission of educating and feeding underprivileged children. Fortunately, my family members were able to take on greater responsibility and we still continue to support the activities of the organization.

I know I'll always miss Ila-di—I will miss her enthusiasm & zest for life; I will also miss our animated conversations about a wide range of topics. Ila-di's memory will always remain alive in my heart and I will fondly cherish our special connection.

Dr. Meghmala Tarafdar

President, Street Children International

ফিচার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গনে ব্রিটিশ কন্যা নেলী সেনগুপ্ত

কৃষ্ণা রায়
পশ্চিমবঙ্গ , ভারত

ব্রিটিশদের পদানত পরাধীন ভারতবর্ষে স্বামী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে ভালবেসে ভারতে এসেছিলেন ব্রিটিশ কন্যা নেলী সেনগুপ্ত, ১৯১০ সালে। সেই তিনিই ইংরেজ-ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মী হয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। কেম্ব্রিজ শহরে এক শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে নেলীর জন্ম, ১৮৮৬ সালের বারোই জানুয়ারি। বাবা ফ্রেডরিক গ্রে, মা এডিথ হেনরিয়েটা গ্রে। নেলীর আসল নাম এডিথ এলেন গ্রে। ১৯০৪ সালে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পর আলাপ হল চট্টগ্রাম থেকে কেম্ব্রিজের ডাউনিং কলেজে ব্যারিস্ট্যারি পড়তে আসা বাঙালি যুবক যতীন্দ্রমোহনের সংগে। তিনি তখন গ্রে-পরিবারেই বসবাস করছিলেন। এডিথ প্রেমে পড়লেন যতীন্দ্রমোহনের । সেই তুমুল প্রেমে ভেসে গিয়ে পরিবারের অসম্মতি থাকা সত্তেও পরস্পর বিবাহিত হলেন ১৯০৯ সালে। বিয়ের পর দম্পতি কলকাতায় এলেন । যতীন্দ্রমোহন তখন কলকাতায় সফল আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত।

অবস্থা বদলাল বেশ কিছু দিন পর । যতীন্দ্রমোহন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিলেন , ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তাঁর অত্যন্ত লাভজনক ও সফল আইন ব্যবসা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে ক্রমে বাঙলায় গান্ধিজীর ডান হাত হয়ে পড়লেন। গান্ধিজী এবং সরোজিনী নাইডুর প্রেরণায় নেলীও স্বামীকে অসহযোগ আন্দোলনের কাজে অনুসরণ করলেন। এরপর যতীন্দ্রমোহন জড়িয়ে পড়লেন শ্রমিক ইউনিয়নে। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে এবং বার্মা অয়েল কোম্পানির শ্রমিকদের সংগঠিত করে শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়ে তুলে ঐতিহাসিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিলেন। বাঙ্গলা-আসাম রেল শ্রমিকদের আন্দোলনে , স্টিমার কর্মীদের আন্দোলনে যোগ দিলেন যতীন্দ্রমোহন। আর এইসব ব্রিটিশ বিরোধী কাজে নিজের পারিবারিক প্রেক্ষাপট বিস্মৃত হয়ে ছায়াসংগী হলেন সহধর্মিনী নেলী। আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ সরকার যতীন্দ্রমোহন প্রথমবার গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দী হলেন । নেলী কিন্তু হাল ছাড়লেন না, চা বাগানের শ্রমিকদের প্রতি ব্রিটিশ প্রভুদের নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

এরপর ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে স্বামীর সংগে যোগ দিয়ে নেলী দিল্লী ,অমৃতসর প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক সফর করলেন , আইন অমান্য করে প্রকাশ্যে চট্টগ্রামের মানুষের দরজায় দরজায় খাদি কাপড় বিক্রির কাজে ব্যস্ত থেকেছেন । বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে সম্পূর্ণ খাদি পোশাক পরা শুরু করেন। বিদেশি বস্ত্র ত্যাগ করে দেশীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিতে হবে, তাই নিজে চরকায় কাটা খাদি কাপড় না পরলে উপায় কি? তাঁকে বার বার সাবধান করা সত্তেও জনসমাবেশ , সভা-সমিতিতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের বিষয়ে জেলা শাসকদের নির্দেশের বিরুদ্ধে মুখর হয়েছেন। দিল্লীতে একটি বেআইনি জনসভায় যোগ দেওয়ার অপরাধে ১৯৩১ সালে চারমাসের কারাদন্ড পেলেন। জেলের ভেতরের নোঙরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নেলীর স্বদেশের মানুষ ইংরেজদের হৃদয়হীন ব্যবহার কিছুই ভোলেন নি পরবর্তী জীবনে। ১৯৭৩ সালে সেকথা নির্দ্বিধায় সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামী যতীন্দ্রমোহনের কারাদন্ড হয়েছে রাঁচিতে। কারাবন্দী অবস্থায় অসুস্থ হয়েছেন , নেলী কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে আসেন নি। সেখানেই ১৯৩৩ সালে

যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু হয়। স্বামীহারা নেলী তখন পুরোপুরি নিজেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ঢেলে দিয়েছেন। এদিকে স্বামীর মৃত্যুর আগেই ১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে একটি "অবৈধ সংস্থা" হিসেবে ঘোষণা করে। তখন নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্রিটিশ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। ১৯৩৩ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে কলকাতায় তাদের ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়। অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, কিন্তু কলকাতায় আসার পথে ব্রিটিশ পুলিশ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এবং কংগ্রেসের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আসানসোল স্টেশনে গ্রেপ্তার করে। এই ক্রান্তিলগ্নে মূল সভাপতি এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার পর, চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেন কংগ্রেস দল। তখন সর্বসম্মতিক্রমে সদ্য বিধবা ইংরেজ বংশোদ্ভূত বাঙালি বধূ নেলী সেনগুপ্ত অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালের ১ এপ্রিল কলকাতার বউবাজার মোড়ে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে পুলিশি বেষ্টনীর মধ্যেই তিনি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন , তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। ভাষণে ব্রিটিশদের দমননীতির তীব্র সমালোচনা করেন, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।এর ফল হল ভয়ানক। অধিবেশন শুরু হতেই পুলিশ নিরস্ত্র কংগ্রেস কর্মীদের ওপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ শুরু করে। বহু কর্মী রক্তাক্ত ও আহত হন। কিন্তু পুলিশের লাঠি ও অত্যাচারের মুখেও পিছু না হটে নেলী সেনগুপ্তর পরিচালনায় কংগ্রেস কর্মীরা দ্রুততার সঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন। অর্থাৎ অধিবেশনটি সফল করে তোলা হয়েছিল। অধিবেশন শেষ হওয়ার পরপরই নেলী সেনগুপ্ত সহ প্রায় ৫০০ জন কংগ্রেস কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বস্তুত কংগ্রেসের সমকালীন প্রেসিডেন্ট পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত নেতার কারাবাস হলে বিদেশিনী নেলী তাঁর শুদ্ধ নিবেদন এবং কর্মদক্ষতার গুণে সেই পদে অভিষিক্ত হলেন । অ্যানি বেসান্ত এবং সরোজিনী নাইডুর পর নেলী ছিলেন তৃতীয় নারী (এবং দ্বিতীয় বিদেশী নারী) যিনি কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। নেলী সেনগুপ্ত যেভাবে কলকাতার নিষিদ্ধ কংগ্রেস অধিবেশন পরিচালনা করেন, গান্ধীজি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। মনে করতেন নেলী একজন ব্রিটিশ হয়েও ভারতীয় নারীদের চেয়ে কোনো অংশে কম ত্যাগ স্বীকার করেননি। গান্ধীজির আদর্শের একজন শান্ত, অনুগত এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, নেলী গান্ধীজির খাদি ও সামাজিক সংস্কারের কাজকে নিঃশব্দে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। গান্ধীজি যখন চট্টগ্রাম সফরে যান, তখন তিনি যতীন্দ্রমোহন ও নেলী সেনগুপ্তর বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন। নেলী সেনগুপ্ত নিজে গান্ধীজির নিরামিষ আহার এবং স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়েছিলেন।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ একাদিক্রমে কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদে ছিলেন। তিনিই প্রথম মহিলা অল্ডারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন । এরপরে ১৯৪০ সালে বাঙলায় আর ১৯৪৪ সালে অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রামের বিধানসভায় কংগ্রেসের টিকিট পাবার জন্য মনোনীত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর প্রতি অমানবিক আচরণের নিন্দা করেছেন।

ভারত স্বাধীন হবার পর নেলী স্বেচ্ছায় নতুন দেশ পূর্বপাকিস্থানে, স্বামীর জন্মস্থল চট্টগ্রামে ফিরে যেতে চান। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর সম্মতিতে সেদেশে গিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকা পালন করেন। পূর্বপাকিস্থানেও ১৯৫৪ সালে বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হন বিনা বাধায়। চট্টগ্রামের সমাজ জীবনে তাঁর ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে , সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বোড়োদের সদস্য হলেন। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। ইন্দিরা গান্ধীর সাগ্রহ উৎসাহে কলকাতায় তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

দুই ছেলে সহ সপরিবারে ভারতে আসার পর পাকিস্থান সরকার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি , বাড়ি, এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্টের দোহাই দিয়ে বাজেয়াপ্ত করে নেয়। নতুন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর ১৯৭২ সালে স্বল্প সময়ের জন্য চট্টগ্রামে ফিরলেও বাকি জীবন কলকাতায় সসম্মানে কাটিয়ে গেছেন। ১৯৭৩ সালে ২৩ অক্টোবর কলকাতাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হওয়া আরেক বিদেশিনী অ্যানি বেসান্ত বা ভারতীয় সরোজিনী নাইডুর মত সমগ্র ভারত এবং বহির্বিশ্বে নেলীর কর্ম পরিধি বিস্তৃত ছিলনা। তাঁর কাজের মূল কেন্দ্র ছিল বাংলা (বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও কলকাতা)। প্রধানত আঞ্চলিক সংগঠন মজবুত করা এবং যুবসমাজ আর বাঙলার নারীদের আন্দোলনে যুক্ত করার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করেন। তবু একথা কি অস্বীকার করা যায় , ভিন্ন দেশের স্বাধীনতার জন্য আমৃত্যু স্বদেশ-স্বজন ছেড়ে থাকা নেলীর এই ত্যাগের মর্যাদা আমরা কি যথাযথ দিতে পেরেছি? ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে তাঁর কথা মনে করে বিবেক দংশন করার ছাড়া আর কি বা করতে পেরেছি? সান্ত্বনা এইটুকু ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, মানব-কল্যাণকেন্দ্রিক কাজের জন্য ভারত-সরকার তাঁকে জীবনকৃতি সম্মান জানিয়েছেন পদ্ম-বিভূষণ উপাধি দিয়ে ।

গল্প

ব্যালান্স

রবীন্দ্র চক্রবর্তী
আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

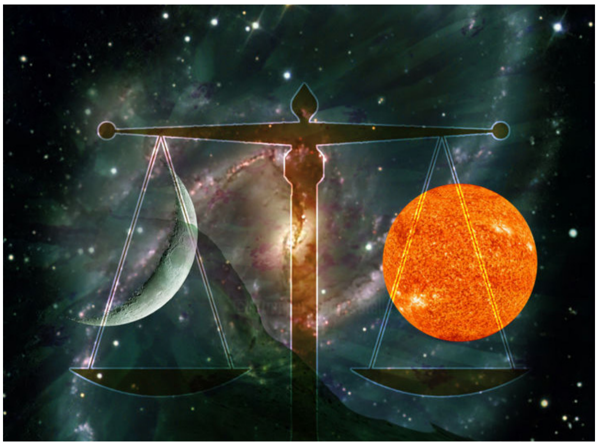

উৎপল নদীর কাছে একটা বড়ো কালো পাথরের ওপর চুপ করে বসে একদৃষ্টে জলের প্রবাহ লক্ষ্য করতে থাকে। আটলান্টা শহরের উত্তরে এই নদীটার একটা আমেরিকান ইন্ডিয়ান নাম - চ্যাটাহুচি। ওর অফিস নদীটার কাছেই। লাঞ্চটাইমে গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে এখানে। মনটা একদম ভালো নেই ওর। কনসেনট্রেট করতে পারছে না। গত একমাস ধরে বাড়িতে প্রায় রোজ কোল্ড-ওয়ার চলছে। আজ সকাল আটটাতে যখন ও বাড়ি থেকে অফিসে বেরোল, তখন পলা একবার নিচেও নামে নি। চা জলখাবার বানিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা। ও স্টারবাক্সের থেকে কফি তুলে অফিসে এসেছে। ওদের চারবছরের মেয়ে রুণু বোধহয় তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে! ও দেখতেও পায় নি। পলা যে দায়িত্বহীন তা নয়। তার মানে ও মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ কিন্তু উৎপল আকাশ পাতাল ভেবেও বুঝতে পারছে না, ও এমন কি ভুল বলেছে বা কি ভুল করেছে!

মেয়ে রুণুকে খাওয়ানোর মতো একটা ছোট ঘটনা থেকে তিল তাল হয়ে উঠেছে। দোষের মধ্যে উৎপল বলেছে, "টিভিতে যখন ওর ফেভারিট 'গ্যাবিস ডলহাউস' প্রোগ্রামটা চালিয়েছ, তাহলে আবার আইফোন দিয়েছ কেন? এগুলো বাচ্চাদের অডিকশন হয়ে যায়।" ব্যস এই একটা কথায় পলা হঠাৎ দুম করে চটে উঠে বললো, "একটা হেল্প করার নাম নেই, শুধু ক্রিটিসাইজ!" উৎপল বললো, "হেল্প মানে! সবকিছুই তো করি।" পলা ঝাঁঝিয়ে উঠল, "করার মধ্যে দুটো রোজগার করো, তাতে মাথা কিনে নিয়েছ! আরে রোজগার তো আমিও রুণু হবার আগে করতাম; ওকে বড়ো করার জন্যে আমি যে কেরিয়ার ছেড়ে দিয়েছি তার তো কোনো দামই নেই।"

উৎপল আকাশ থেকে পড়লো; এসব কথা কোত্থেকে আসছে? একটু হতভম্ব হয়ে বললো, "আমাকে দাও, আমি ওকে খাইয়ে দিচ্ছি।" পলা রাগতস্বরে বললে, "খাওয়াতে দেব, আর অর্ধেকটা খাইয়ে উঠিয়ে দেবে। তারপর আধপেটে ও ঘুমোতে যাবে আর মাঝরাতে জ্বালাতন করবে।"

এবারে উৎপলের একটু মেজাজটা গরম হলো, "কেন আমি কিছু বুঝি না? আমার আন্ডারে বারোজন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে আর আমি বুঝতে পারবো না রুণুর কতটুকু খিদে আর ওর পেট ভরেছে কিনা? আর হ্যাঁ! তোমার মতো ওরকম গাঁতিয়ে গাঁতিয়ে খাওয়ানো মোটেও হেলদি নয়। সেখান থেকে আজকের যুগের এই অবিসিটি প্রব্লেমের সূচনা।"

পলা সংঘাতিক ক্ষেপে গিয়ে, সশব্দে চেয়ারটা দূরে ছিটকে দিয়ে চামচ-সমেত খাবারের বাটিটা রুণুর হাই চেয়ারের ট্রে এর ওপর রেখে দুমদুম করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। সেই দেখে ছোট্ট রুণু মারাত্মক জোরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো। উৎপল ওকে কোলে নিয়ে পায়চারি করতে করতে ওকে ভোলাতে লাগলো। মিনিট পনেরো পরে রুণু শান্ত হলে ওকে খাইয়ে, চেঞ্জ করিয়ে যখন ওপরের মাস্টার বেডরুমে এলো তখন দেখলো পলা বালিশ বিছানা নিয়ে পাশের ঘরে মানে গেস্ট বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কি মুশকিল?

উৎপল বুঝলো, এখন মিটমাট সম্ভব নয়, মেয়েটাকে গল্প, গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে প্রায় নয়টা বেজে গেল। তখন ও গেল স্নান করে রান্নাঘরে ডিনার করতে। ফ্রিজ থেকে খাবার বার করে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করে খেল। পলা কিছু খেয়েছে কিনা সেটাও ও জানে না। কিন্তু ও স্থির করলো, খিদে পেলে নিজে এসে ঠিক খাবে, ও তো আর কচি খুকি নয়।

সেই সন্ধ্যের পর থেকে ও পলাকে দেখেই নি, কথা হওয়া তো দূরের কথা। তবে রাতে কোনো সময় এসে যে ও রুণুকে নিজের কাছে নিয়ে গেছে সে উৎপল টের পায় নি। সেজন্যেই ও সকালে রুণুকে বেরোনোর আগে দেখতে পায় নি। যদিও অফিসে বেরোনোর সময় পলাকে একটা টেক্সট করেছিল কিন্তু সেটা এখনো আনরেড দেখাচ্ছে। উৎপল বুঝে পায় না কি করবে? ও নিজের ঝামেলা নিজেই সামাল দিতে চায়। দেশে ও নিজের বা পলার মা-বাবাকে বিব্রত করতে চায় না। মনে মনে ভাবে বাইরে থেকে দেখে সবাই ভাবে ওদের কি সুখের জীবন কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা নয়| হঠাৎ কেন জানি ওর নিজেকে একটু একা একা লাগে।

সেইসময় ওর চিন্তার স্রোতকে বাধা দিয়ে দুটো সবুজ-গলা-ওলা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে নদীর ওদিক থেকে উড়ে এসে ওর পাথরের কাছে নেমে জলে সাঁতার দিতে লাগলো। মনে হলো হাঁসগুলো যেন ওকে সঙ্গ দিতে এসেছে। মাঝ নদীতে অনেকটা জল, নদীর স্রোতও বেশি। ওখানে অনেক বড়ো বড়ো আধ-ডোবা পাথর। তবে এই কিনারায় হাঁটুজল। স্রোত প্রায় নেই বললেই চলে। এমনকি জল এতটাই স্থির যে একটু আগে জলে ও গাছের ছায়ার নিখুঁত প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছিল তবে

হাঁসগুলোর সাঁতারে জলে অবশ্য এখন হালকা ঢেউ উঠছে। সেই গাছের ছবিগুলো প্রাচীন কালের টিভির পর্দার ছবির মতো জলের ওপর ঝিরঝির করে কাঁপছে।

উৎপল ঘড়ি দেখলো এবার অফিসে ফেরত যেতে হবে। উঠে পড়লো। গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলো ওর আর পলার মধ্যে এরকম ঝগড়া-ঝাঁটি হওয়া শুরু হলো কবে থেকে! আজ যে কোনো ব্যতিক্রম তা নয়; সপ্তাহে দু-তিনদিন বাড়িতে এরকমই তুলকালাম কান্ড হয়। উৎপলের ধারণা পলার মাথায় যত উল্টো-পাল্টা যুক্তি দেয় ওর ওই বন্ধু প্রিয়া। প্রিয়া একনম্বরের ফেমিনিস্ট, নিজে তো ডিভোর্স করেইছে দুবছর আগে, এখন পলার মাথা বিগড়াচ্ছে। কিন্তু প্রিয়াকে নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। পলা ওর ব্যাপারে ভীষণ প্রোটেক্টিভ।

গাড়ি চালাতে চালাতে উৎপলের মনে অনেক পুরোনো স্মৃতি ভেসে উঠতে থাকে। পলার সঙ্গে উৎপলের আলাপ যাদবপুরে; ওর চেয়ে দুবছরের জুনিয়র। উৎপল ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ; পলা মাস-কমিউনিকেশনের ছাত্রী। ওদের আলাপ লাইব্রেরিতে। সেই থেকে প্রেম। সে বেশ অনেক বছর আগের কথা। সবাই বলতো ওদের জুটি মেড-ইন-হেভেন। ওদের বাড়িতেও কোনো আপত্তি ছিল না। তারপর উৎপল এসেছে আমেরিকায়। কম্পিউটার সায়েন্সে কার্নেগি-মেলন থেকে মাস্টার্স করেছে। তারপর কথামতো পলাকে বিয়ে করে এনেছে এদেশে। কেরিয়ারে ভালো রাইস করেছে গত তিনবছরে। এখন উৎপল এ. আই. লিড; কাজ করে ডিলয়েটে।

বছর দুয়েক আগে শিকাগো থেকে মুভ করে এসেছে এখানে। এসেই সুন্দর একটা বাড়ি কিনেছে। এটাই ওদের প্রথম বাড়ি। বাইরে চমৎকার লন। একধারে গোলাপ গাছের সারি; তার মধ্যে মধ্যে রডোডেনড্রন গাছ। পলা খুব খুশি, দুবছরের মেয়ে রুণুকে নিয়ে ওর স্বপ্নের জগৎ যেন কানায় কানায় পূর্ণ। সুযোগ পেলেই মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে বরের সঙ্গে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। বন্ধু-বান্ধবরাও ওর ছবিতে থাম্বস আপ, লাইক মেরে সেই গৌরবকে জীবনকে আরও স্বর্গময় করে তোলে। বছর দেড়েক আগেও এই সুন্দর জীবন ছিল ওদের। ইতিমধ্যে পলার মা-বাবাও ঘুরে গেছেন এক রাউন্ড।

ওর মনের মধ্যে চিন্তার গাড়ি চলতে থাকে। আটলান্টার উত্তরপূর্ব সবার্ব যথেষ্ট আপস্কেল। এ জায়গার বাড়িঘর, দোকানপাট, রাস্তাঘাট সবকিছুর মধ্যেই একটু অন্যরকম চাকচিক্য। প্রায় সবার চোখই এই অঞ্চলের প্রতি কিন্তু ভালো রোজগার না করলে এদিকে থাকা সম্ভব নয়। উৎপল কতজনকে জানে যাদের কাছে এখানে থাকার ইচ্ছে স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেছে সারাজীবন। কিন্তু পলাকে উৎপল তো সেই সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাও ও এতো অখুশি কেন?

যদিও এখনো কোনোদিন ডিভোর্সের কথা ওঠে নি, তবে যে কোনোদিন উঠতে পারে। উৎপল মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভেতরের অশান্তিটা যায় না। ওর মনে পড়ে মাসখানেক আগেকার একদিনের কথা। ওর মনে হয়েছিল, "ধ্যুৎ শালা! এতো ঝুট-ঝামেলার চেয়ে ডিভোর্স বেটার! আমেরিকার বন্ধুদের তো সবারই এক রাউন্ড ডিভোর্স হয়ে গেছে। সাদা ছেলেরা ওর মতো এতো সহ্য করবেই না!" সচরাচর কাউকে ও নিজেদের বাড়ির ঝুটঝামেলা বলে না। কিন্তু ওদিনটা ছিল ব্যতিক্রম। ও এতো ডিস্টার্বড ছিল, যে ওর পাড়ার ছোটবেলার বন্ধু নেহাকে ফোন করে। নেহা থাকে লস এঞ্জেলেসে। নেহাৎ নেহার বিয়ে আগে হয়ে যায় আর সেই সময়ে ওর কপালে পলা জুটে যায়, নয়তো নেহাকে বিয়ের কথা কলেজ-দিনে যে ওর মাথায় আসে নি তা নয়। নেহার সঙ্গে ওর বিয়ে হলে হয়তো ভালোই হতো, কে জানে? তবে সেদিন ফোনে উৎপলের কথা শুনে নেহা উৎপলকে এক ধমক দেয়। বলে, "পলার নিশ্চয় কিছু গ্রিভান্স আছে, তুই বোঝার চেষ্টা কর।" শুনে উৎপল আপত্তি করে বলেছিল, "আর আমার কোনো গ্রিভান্স নেই। ওকে তো আমার মতো বসের গালি খেতে হয় না। আজকাল এ. আই এর কাজের ডেডলাইন কি মারাত্মক সে তোরা বুঝবি না।" নেহা খুব নরম হয়ে বলেছিল, "আমি সব বুঝতে পারি রে; তোকে আমি কবে থেকে চিনি বলতো? তা ছাড়া তুই যে আমাকে ভালোবাসতিস সে আমি ভালোই জানতাম; আর আমারও তোকে ভালোলাগতো। তোকে ভালোবাসি বলেই তো বলছি এসব ছোটখাটো ব্যাপারে ডিভোর্সের কথা কখনো মাথায় আনবি না। দরকার পড়লেই কল করবি; আমার সঙ্গে কথা বলবি; মন হাল্কা হয়ে যাবে।

বিবাহিত জীবনে নেহা উৎপলের চেয়ে সিনিয়র। ওর দুটো বাচ্চা; একজন মিডিল স্কুলে আরেকটা এলিমেন্টারীতে। উৎপল জানে নেহা ওর শুভাকাঙ্খী। সেজন্যে ওর কথা শুনে ডিভোর্সের চিন্তা ও আর করে নি। ইতিমধ্যে উৎপল অফিসের পার্কিং লটে এসে পৌঁছে গেছে। গাড়ি থামিয়ে অফিসে ঢুকতে যাবে হঠাৎ ওর মাথায় একটা লাইট-বাল্ব জ্বলে ওঠে। মনে হয় এই পরিস্থিতির একটা সুরাহা আছে তবে তার জন্যে অনেক কাজ করতে হবে।

কি ভেবে ফোন করে পলাকে। পলা দুটো রিং এই ফোন তোলে; বলে, 'সরি, তোমার সকালের টেক্সটটা এখনই দেখলাম, সকালে শরীরটা ভালো লাগছিল না, তাই নিচে নামি নি, তুমি তো সকালে কিছু খাও নি দেখলাম, ভালো করে লাঞ্চ করে নিও। সন্ধ্যেতে ফুলকপি দিয়ে মাছ বানাচ্ছি, তাড়াতাড়ি চলে এস। ঠিক আছে?

পলা ম্যাজিক জানে। ফুলকপি দিয়ে রুইমাছ উৎপলের ভীষণ প্রিয়। উৎপল ভেবেছিল বলবে আজ রাতে ফিরতে একটু দেরি হবে, তার জায়গায় বললো "নিশ্চয়! শরীর ভালো লাগছিল না তো আমাকে বলা উচিত ছিল, আমি খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরতাম!" পলা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললো, "তখন মাথা ধরেছিল। এখন একদম ফিট! তাড়াতাড়ি চলে এস কেমন? মিস ইউ! বাই!!

সে রাতটা খুব সুন্দর কাটলো। ডিনারের পরে রোমান্সও জুটলো উৎপলের কপালে। তারপরে পলা ওকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি মিষ্টি স্বরে বললো, 'কাল তুমি একটু বাড়ি থেকে কাজ করবে প্লিস। ওই করবী আছে না, ওরা সব টিকিট কেটেছে 'ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা ২' এর। ম্যাটিনি শো। তারপর ওরা গালর্স নাইট আউট প্ল্যান করেছে। আমার ফিরতে ফিরতে রাত নয়টা হয়ে যাবে। যাবার আগে আমি রুণুকে স্নান করিয়ে দেব, তুমি ওকে একটু খাইয়ে দিও, কেমন? দুপুরের, সন্ধ্যের খাবারের সব ব্যবস্থা

আমি করে যাব।' উৎপল মুখে বললো, 'ডোন্ট ওয়ারি। খুব ভালো। টেক এ ব্রেক। অফিসে আমি ব্যবস্থা করে নেব।' কিন্তু মনে মনে ভাবলো, 'এখন বুঝছি ওইজন্যে আমার সঙ্গে এতো ভালো ব্যবহার! দিব্যি ম্যানিপুলেট করছে তো আমাকে। রুণুকে খাওয়াতে বলতে আজ তো কোনো দ্বিধা দেখলাম না'।

কিন্তু তার পরমুহূর্তেই উৎপলের মনে হয়, ওর মাথায় যে আইডিয়াটা এসেছে, সেটার আসল দর ও যেন এখন ঠিক ঠাহর করতে পারলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে এই আইডিয়াটাকে ডেভেলপ করতে হবে। এইবার ওর ইঞ্জিনিয়ারিং মাথা চলতে শুরু করেছে। উৎপল জানে ওর খাটনি দ্বিগুণ হতে চলেছে কিন্তু ও পরোয়া করে না।

পরদিন সকালে কফি বানিয়ে ওর নিচের কাজের ঘরে আসে। একাই কাজ শুরু করে দেবে। ওর ইচ্ছে, ও একটা এ. আই. এজেন্ট তৈরী করবে যা ওর সেলফোনে থাকবে আর যা গলার স্বর চিনে আক্টিভেট করবে। পলার আর ওর মধ্যের কথোপকথন শুনে বা ওদের টেক্সট পড়ে এজেন্টটা শিখতে চেষ্টা করবে দুজনের মনের অফ-ট্রিগারগুলো। কোন কথার পরে ওদের গলার টোন বদলায়; কখন ওরা চুপ করে যায় কিংবা কখন ওদের গলার স্বর চড়তে থাকে।

উৎপল জানে অনেক মানুষ বক্তব্যের চেয়ে টোনে বেশি ক্ষুব্ধ হয়। ও তার মধ্যে একজন। অনেক জিনিস একটু সুন্দর করে বললে ও মেনে নিতে রাজি আছে; কিন্তু দুমদাম অপমানকর কথা বা টোন কষা ওর একদম সহ্যের বাইরে। নিজের কমতির কথা ভাবতেই মনে হয়, পলার গার্লর্স নাইট আউট এ যাওয়ায় ও কেন মনে করলো ওকে ম্যানিপুলেট করছে? ও তো চায় ওর বৌ খুশি থাকুক, বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে গেলে কি এসে যায়! শুধু এইটুকু অনুমতির জন্যে পলা ওর প্রিয় খাবার রান্না করেছে; একটা মধুযামিনী উপহার দিয়েছে। উৎপল হেসে ফেলে নিজের মনে। মাঝে মাঝে তার মানে ও নিজেও বোকামো করে। পলারও নিশ্চয় অনেক কমতি আছে, তা সে কার নেই। খুঁজলে তো ভগবানেরও হাজার দোষ বার করা যায়; কিন্তু বিবাহিত জীবনের তা তো লক্ষ্য নয়। মনটা ওর শান্ত হয়ে যায়। জীবনের একটা নতুন দৃষ্টিকোণের হদিশ মেলে। দূর থেকে দেখে রুণু একটা পুতুল নিয়ে খেলার ঘরে খেলছে। পুতুলকে সে চান করাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে। পলা রান্নাঘরে কিসব যেন করছে; ও খুটখাট আওয়াজ পাচ্ছে। হঠাৎ কি মনে হলো উৎপলের। ও রান্নাঘরে গিয়ে পেছন থেকে পলাকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমু খেল; পলা বলে উঠলো 'আরে! কি করছো? রুণু সব দেখছে!' উৎপল মুখে কিছু বললে না শুধু হাসলো। মনে মনে বললো, এই আদরটা কালকের অন্যায় ভাবনার ক্ষতিপূরণ!

এরপর দুমাস জোর কদমে কাজ করে চললো উৎপল। পলা ভাবলো ওর প্রজেক্টে হঠাৎ চাপ এসে গেছে। তিনমাসের মাথায় উৎপল একটা প্রোটোটাইপ বানিয়ে নিজের সেলফোনে আপলোড করলো। প্রোডাক্টের নাম দিয়েছে - ব্যালান্স। এই এ. আই এজেন্টটা পলার পক্ষের এজেন্ট; মানে ও চাইবে পলার চোখ দিয়ে উৎপলের কথার অর্থ বুঝতে। অন্য এজেন্টটা ওকে পলার ফোনে আপলোড করতে হবে, সেটা হবে উৎপলের এজেন্ট; যেটা উৎপলের ভিউ-পয়েন্ট থেকে ওদের কথোপকথন বিশ্লেষণ করবে। তবে পলাকে ও কথাটা জানাতে চায় না। ও যদি বেঁকে বসে বা বলে তুমি আমার ওপর স্পাই করছো!

তাই সেদিন রাতে ফোন আপডেট করার নাম করে ও পলার ফোনে এ.আই এজেন্টটা ইনস্টল করে দেয়। প্রতিরাতে দুটো এজেন্ট তাদের পর্যবেক্ষণ ক্লাউডে আপলোড করতে থাকে এবং আপোষ-বিশ্লেষণ করে দেখে কোথায় ওদের পারস্পরিক ইন্টারপ্রেটেশন ভুল দিকে বাঁক নিচ্ছে! উৎপল এমন করে এজেন্ট কনফিগার করে যে একমাত্র ও-ই জানবে কখন ওদের কথাবার্তা ভুল দিকে মোড় নিতে চলেছে; ফোনের থেকে শলা-পরামর্শ কেবল ও পাবে, পলা নয়। তাই ঝগড়া এড়ানোর পুরো দায়িত্ব ওর ওপর। ফোন ওদের মন কষাকষির একটা স্ট্যাটিসটিক্সও রাখতে থাকবে যাতে ও বুঝতে পারে ওর এজেন্ট ওকে কতটা সাহায্য করছে। যখন পলার ফোন কনফিগারেশন প্রায় শেষ তখন উৎপলের হঠাৎ মনে হয় ওই যত-নষ্টের-গোড়া প্রিয়া ওকে কি পরামর্শ দেয় সেটা ওর এজেন্টের জানা খুব উচিত। চটে থাকলে পলাকে প্রিয়া সহজেই ভড়কাতে পারে। আর প্রিয়া বিয়ে সম্বন্ধে এতো বিটার, যে ওর পরামর্শ কখনো ওদের জীবনে ব্যালান্স ফেরাতে সহায়তা করবে না। তাই খানিক দোনোমোনো করে ও প্রিয়ার ফোনে ওর-আর পলা ছাড়া প্রিয়ার আর পলার কথোপকথন শোনার পারমিশান দিয়ে দেয়।

সে রাতে ও ভালো ঘুমোতে পারে না। মনে মনে জানে ও যে কাজটা করছে সেটা একটু অন্যায়; তবে উপায় নেই। ওদের যুগল-জীবন বাঁচাতে হলে এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ম্যারেজ-কাউন্সিলারদের মতো মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা বানানো লোকদের ও একবিন্দু বিশ্বাস করে না। ওর মতে তারা সি. এন. এনের পরনিন্দা-পরচর্চা করা এক্সপার্ট প্যানেল যাদের একমাত্র কাজ হলো অন্যদের পিন্ডি চটকানো, তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট মনের মানুষ। ঘুমোনোর আগে পলাকে একটু খোশামোদ করে কথা বলে উৎপল; সন্ধ্যেতে পলা যে ড্রেসটা পরেছিল সেটাতে ওকে খুব সুন্দর লাগছিল সেটা বলে। পলার ভালো লাগে। তারপর বিভিন্ন ভাবনা ভাবতে ভাবতে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর রুণু ওদের মাঝে একজনের ওপর মাথা আরেকজনের ওপর পা দিয়ে নিশ্চিন্তির ঘুম ঘুমোতে থাকে।

এরপর মাস দুয়েক কেটে যায়। ওদের মধ্যে ঠান্ডা-গরম লড়াই চলতেই থাকে। উৎপল পলার মায়ের জন্মদিনে উইশ করতে ভুলে যায়; পলা সে অপরাধ সহজে ক্ষমা করে না। আবার একদিন উৎপল এ. আই এজেন্ট এর বিশ্লেষণ থেকে জানতে পারে যে প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময়ে পলা প্রিয়াকে বলে উৎপল গত দু-আড়াই মাস রোজই অনেক দেরি করে অফিস থেকে ফিরছে। প্রিয়া সাথে সাথে ওকে বলে, 'ছেলেদের একটু টাইট লিশে রাখা উচিত, ওদের বেশি ছুট দিলেই, ওরা অফিসে এর ওর সঙ্গে গিয়ে ফস্টি-নস্টি করবে।' পলা যদিও বলে, ওদের প্রজেক্টে খুব চাপ, কিন্তু প্রিয়া ওকে সেটা অন্ধের মতো বিশ্বাস না করতে উপদেশ দেয়। উৎপলের এটা শুনে গা-পিত্তি জ্বলে ওঠে, কিন্তু এ. আই এজেন্ট ওকে পুরো ব্যাপারটা হজম করে নেবার ইন্সট্রাকশন

দেয়। বরং এ. আই এজেন্ট বলে, ও যেন রাতে পলার জন্যে একটা কোনো গিফ্ট নিয়ে বাড়ি যায় আর পলাকে আশ্বস্ত করে। উৎপল ভাবে গিফ্ট নিয়ে গেলে নির্ঘাৎ পলার সন্দেহ বাড়বে; এ. আই. হয়তো আমেরিকান মেয়েদের মতো করে ওর বৌকে মডেল করছে, কিন্তু পলা ষোলো আনা বাঙালি। তাই সে রাতে ও পলার প্রিয় 'ইন্ডিয়ান চাইনিজ' নিয়ে বাড়ি ফেরে, আর এসেই একগাল হেসে বলে, 'প্রতিদিন তোমার কাছে দেরি করে ফেরার জন্যে সরি। আজ ভাবলাম তোমার প্রিয় খাবারটা নিয়ে বাড়ি আসি।'

পলার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'আমি জানি তোমার কাজের অনেক চাপ। আমি তো আর রোজগার করে তোমায় সাহায্য করি না। ইটস ওকে।'

উৎপল ভেতর ভেতর খুব খুশি হয়। তার মানে ওর তৈরী এ. আই আপ্লিকেশন কাজ করতে শুরু করেছে। এমনি করে আরও মাসখানেক কাটে। এ. আই এখন ওদের নেচারটা অনেকটা শিখে ফেলেছে। পলার সঙ্গে কথোপকথনের সময় যখনই তাপমাত্রা একটু চড়তে থাকে তখনই উৎপল মোবাইলে এলার্ট পেতে থাকে। উৎপল টুক করে বাথরুমে গিয়ে পুরো আনালিসিসটা পড়ে ফেরত এসে ওর চিন্তার দিক বদলায়। কখনো পলার সঙ্গে সহমত হয়ে যায়, কখনো বলে 'আমি তোমাকে সাহায্য করে দেব চিন্তা করছো কেন?'

সময়ের সাথে সাথে পলার মনের একটা অজানা দিক উৎপল আবিস্কার করে ফেলে। পলা ভ্যালিডেশন চায়, ক্রিটিসিজম নয়। ও শুনতে চায়, উৎপল যেন জানে ও ওর সাধ্যমত চেষ্টা করছে। আজকাল এ. আই ছাড়াও উৎপল ওর কথার মধ্যে একটা আশ্বাস প্রতিশ্রুতি ক্রমাগত দিতে থাকে। তাতে ওদের সম্পর্ক ম্যাজিকের মতো মেরামত হতে শুরু করেছে।

এদিকে আমেরিকান অর্থনীতির অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে; ডিলয়েটে অনেক লোক ছাঁটাই হয়ে গেছে। ওর ডিপার্টমেন্টেই স্টাফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম। আরো ছাঁটাই হবার সম্ভাবনা সর্বজনবিদিত। উৎপল বাড়িতে কিছু বলে না। মনে মনে চিন্তা বাড়তেই থাকে। একটু ক্লান্ত লাগে নিজেকে। অনেক কষ্টে বাড়ির পরিবেশটা একটু সামাল দিতে না দিতে আরেক ফ্যাচাং দোরগোড়ায় হাজির। ওর চাকরি না থাকলে ওদের বাড়ির ওপর তার প্রভাব কেমন পড়বে, সে ও খুব ভালো করেই বুঝতে পারে। রুণু তো এইটুকুমাত্র। পলার পক্ষেও চাকরি পাওয়া এতো সহজ হবে না। ও আর ভাবতে চায় না। কিছু একটা ওকে করতে হবে।

বাড়ি ফেরার রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসে। ও যদি ওর প্রোটোটাইপটা নিয়ে ভিসির কাছে যায়। যদি তাঁরা ওকে ফান্ডিং করেন, তাহলে ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরো দমে নিজের কোম্পানি চালাবে। পলাকে তবুও এখনো কিছু বলাটা ঠিক হবে না। একসপ্তাহ ধরে ইনভেস্টারদের জন্যে একটা প্রেসেন্টেশন বানায়, তারপর বিভিন্ন ইনভেস্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে।

বেশ কিছুজন ইন্টারেস্ট দেখালেও কথা আগে বাড়ে না। তারপর ওর মনে পড়ে আনন্দ এর কথা; সে ওর স্কুল জীবনের ক্লাসমেট ছিল। শুনেছিল আনন্দ ভালো পয়সা বানিয়ে শিকাগোর একটা ভিসি ফার্মে জয়েন করেছে। ও সে রাতে আনন্দকে ওর প্রেসেন্টেশন ডেক পাঠায়। পরের দিন আনন্দ ওকে কল করে কথা বলে; বলে ওর আইডিয়ায় দম আছে। ও দু-সপ্তাহের মধ্যে একটা ডেমো দেখানোর দিন স্থির করবে প্রতিশ্রুতি দেয়; সেখানে ও ওর পার্টনারদের নিয়ে আসবে একটা কনফারেন্স কলে। উৎপল স্থির করে পলাকে এবার সবকিছু বলবে। সেদিন অফিস থেকে দুপুর নাগাদ বাড়ি ফেরত আসে। পলাকে নিজের পাশে বসায়। বলে ওদের চাকরিতে ডামাডোল চলছে; শুনে পলার মুখ কালো হয়ে যায়। অনিশ্চয়তার ছাপ চোখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। উৎপল বলে, 'চিন্তা কোরো না; আমি একটা উপায় ভেবেছি তবে তোমার সম্মতি ও সঙ্গ দুটোই চাই।' উৎপল ওর প্রেসেন্টেশন খুলে টেকনলজিটা কি ভাবে কাজ করে সেটার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। তারপর বলে আমি এটা আমাদের ওপর টেস্ট করে দেখেছি এপ্লিকেশনটা ভালো কাজ করে। তারপর ওর মোবাইল থেকে কিছু এলার্ট খুলে দেখায়।' উৎপল বলে, 'সরি! এটা আমার তোমাকে আগে বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমার বলার হিম্মত হয় নি।' পলা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।পলাকে এরকম চুপ থাকতে উৎপল আগে কোনোদিন দেখে নি। একটু ভয় পায় ওর কি রিঅ্যাকশন হবে সেটা ভেবে। মিনিট দুয়েক পরে পলা ওখান থেকে উঠে চলে যায়। উৎপল প্রমাদ গোনে। ও বাথরুমে কলের আওয়াজ শুনতে পায়। বেশ পনেরো মিনিট পরে পলা ফেরত আসে উৎপলের কাছে, বলে, 'হ্যাঁ! তুমি অন্যায় করেছ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের বিয়েটাকে সুন্দর করে তোলার দায়িত্ব তোমার একার নয়। আমার ফোনেও এপ্লিকেশন লোড করে দাও, আমাকেও যেন এ. আই. এলার্ট পাঠাতে পারে। তোমার মনে কষ্ট দেওয়া আমারও লক্ষ্য নয়।'

উৎপল খানিক পলার মুখের দিকে চেয়ে বলে, সেই জন্যেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তুমি আমার ফিফটি পার্সেন্ট পার্টনার হবে; কোম্পানির নাম দিয়েছি রুনুডটকম। এই বুধবার দিন এ.বি.সি ভেঞ্চার আমাদের প্রোডাক্ট ডেমো দেখতে চায়। তুমি হবে কোম্পানির চিফ মার্কেটিং অফিসার আর আমি সি. টি.ও। তবে বিজনেস টক বাড়িতে হয় না। চলো তৈরী হয়ে নাও - থাই রেস্টোরেন্টে খেতে খেতে কথা বলবো।

এর সপ্তাহ কয়েক পরে রুণুকে ডে-কেয়ারে পাঠিয়ে দুজনে হোম-অফিসে পাশাপাশি কাজ শুরু করে। এ.বি.সি ভেঞ্চার ওদের দেড় মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এখন অন্যদিকে মন দেবার সময় নয়। ওদের চব্বিশ ঘন্টা কাটবে হয় রুণুকে ঘিরে নয় রুণুডটকমকে ঘিরে!!

ফিচার

দুর্গাপুজোর আজব খবর

ড. শিবশঙ্কর পাল
পশ্চিমবঙ্গ , ভারত

(হর-পাবগতী ও দক্ষ-নারদ : রায়পুর)

পুজো মানে গ্রাম। পুজো মানে বিদেশ থেকে দেশে। ঘরে। পুজো মানে পুরনো বন্ধু। জমিয়ে আড্ডা। গুছিয়ে খাওয়া। পুজো মানে প্রেমে পড়া। পাতা ভর্তি নতুন গল্প, উপন্যাস। পুজো মানে ঢাকের বাড়ি। ধুনুচি নাচ। সিঁদুর খেলা। পুজোয় আবার ধুতি পাঞ্জাবি। সপাট করা শাড়ির পাড়। ধূপকাঠির আগুন দিয়ে পটকা ফাটে ফটাস ফটাস। ঘর দুয়ারে মাটি গোবর। গরু ছাগল নতুন দড়ি। নদীর পাড়ে সাদা কাশ। গাছের নিচে শিউলি ফুল। ঘন্টা কাঁসর। দোলায় চড়ে কলাবউ। নাপিত মশায় খুব ব্যস্ত। পুরোহিতের সন্ধিপুজো। বীরেন ভদ্রের চণ্ডীপাঠ। কুসুম বীজ আর মুড়কি নাড়ু। গ্রাম শহরে ঠাকুর দেখা। কোন দুর্গার মুখটা সরু। কোন কার্তিক গোঁফ ছেঁটেছে। কোন অসুরের মাসল মোটা। আতসবাজি। প্যান্ডেলে ভীড়। নানা থিমের কোনটা সেরা! কোন ক্লাব শেষ জিতল ট্রফি- এই হলো পুজোর একটা সাধারণ ছবি। চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু এর বাইরেও দুর্গাপুজোর নানা ভিন্নতা আছে। আছে সাধারণের বাইরে নানা রেওয়াজ। যা দুর্গাপুজোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। কোথাও ব্যতিক্রমকে বয়ে চলে বিশেষ পরিবার। কোথাও ব্যতিক্রমের মাঝে টিকে থাকে ইতিহাস, গল্প, বিশেষ কারন।

ঝাড়গ্রামের শালবনি গ্রাম। গ্রামে হয় হুদুর দুর্গা। এখানে অসুরকে পুজো করে আদিবাসীরা। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় আগে দুর্গাপুজোর সময় অশৌচ পালন করা হত। ওরা নিজেদের অসুরের বংশধর ভাবে। এখনও তার কিছুটা রেশ আছে। অন্যদিকে মলদা জেলার ভাঙাদিঘি গ্রামে আদিবাসীরাই করে দুর্গাপুজো। তবে এই পুজোর মন্ত্র উচ্চারিত হয় আদিবাসী ভাষায়। পুরুলিয়ার আদিবাসীদের দুর্গাপুজোয় হয় দাঁশায় নাচ। যে নাচে দুর্গার হাতে অসুর হত্যার জন্য শোকপ্রকাশ দেখা যায়। বৈচিত্রময় বাংলার দুর্গাপুজো। সাধারণের বাইরে নানা কাণ্ডের আয়োজন ওসবে। কোথাও দুর্গাদেবী দ্বিভুজা। যেমন হুগলী জেলার পাটুলির মঠবাড়ির দুর্গাপুজো। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ে এই পুজো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি হল মঠ বাড়ি। এখানে মায়ের হাতে ত্রিশূল নয়, থাকে ফুল। হাত থাকে অভয় মুদ্রায়। এখানে নরবলির রূপক আয়োজন করা হয়। কোথাও আদিবাসীরা মারাংবুরুর পুজোমন্ত্রে পুজো করে মায়ের। এটা হয় আসানসোলের নিয়ামতপুর গ্রামে। এখানে কার্তিকের কাছে থাকে নরসিংহ। দুর্গা-অসুরের রূপক যুদ্ধেরও আয়োজন করা হয় এই গ্রামে। আসানসোলের ধেনুয়া গ্রামে পুজো শুরু হয় মহালয়ায়। শেষ হয় মহালয়ায়। বিসর্জনও মহালয়ার দিন। গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রামে পুজোর সাধারণ প্রচলনকে পাশ কাটিয়ে রীতি মেনে নানা ব্যতিক্রমী রেওয়াজ দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার সাহোড়া গ্রামে পাঁচ পুতলার প্রতিমা হয়- জয়া-বিজয়া, অসুর, সিংহ, মহিষ, দুর্গা। কার্তিক গণেশ লক্ষী সরস্বতী এই পুজোয় দেখা যায়না। এই জেলার রঘুনাথগঞ্জের বহুরার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু করে ডাকাতরা। এই পুজোয় মায়ের প্রথম ভোগ প্রস্তুত করে মুসলীমরা। আবার দক্ষিণ দিনাজপুরের ফুলহারা গ্রামে যে দুর্গা হয় তা আসলে মনসা। বেদীতে দেখা যায় স্বয়ং মহাদেবকে।

পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় ব্যতিক্রমের বৈচিত্র যেমন দেখা যায় তেমনই দেখা যায় বীরভূমের নানা স্থানে। পুজোর সময় বীরভূম পরিক্রমা তাই আলাদা একটা আকর্ষণ। এই জেলার মুরারই লাগোয়া মিত্রপুর গ্রামের দালানবাড়িতে হয় এগারো পুতলার প্রতিমা। অতিরিক্ত থাকে জয়া-বিজয়া, রামচন্দ্র, বরুণদেব। এই পুজো প্রচলন করেন মহেশপুরের রাজা। ১০৮টি ডাকাতকে সংহার করার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। এই গ্রামেরই কর্মকার বাড়িতে যে পুজো হয় তা শুরু হয় অষ্টমীর দিন।

সেদিনই ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমীর পুজো করা হয়। এটি মূলত একদিনের পুজো। বীরভূমের বোলপুর লাগোয়া রায়পুর গ্রামে বেদীতে থাকে দুর্গা-শিব। দক্ষরাজ থাকে শিবের পাশে। দুর্গার পাশে নারদ। কর্তিক লক্ষীরা এখানে থাকেনা। রামপুরহাটের সুলুঙ্গা গ্রামের আদিবাসীরা একদা ব্রিটিশদের দেশ ছাড়া করার জন্য মা দুর্গার স্মরণ নেয়। মায়ের কাছে প্রার্থনা করে যদি ব্রিটিশ দেশ ছাড়ে তাহলে সাদা ছাগ উৎসর্গ করা হবে। সে থেকে আজও দুর্গাপুজোর সময় সাদা ছাগল বলি করা হয় ওখানে। রামপুরহাট ঘেঁষা মল্লারপুরের রায়বাড়ির পুজোতে আছে মল্ল

রাজার গল্প। এখানে দেবী কুমারী রূপে পূজিতা। দেবী এখানে দ্বিভুজা। এই পুজোয় অন্নভোগ হয়না। আবার বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর-১ নম্বর ব্লকের দক্ষিণগ্রামের পুজো কমপক্ষে পাঁচশো বছরের পুরনো। গোপাল আচার্য এই পুজোর প্রচলন করে। ষষ্ঠীর বারো দিন আগে অর্থাৎ বোধনের দিন থেকে এখানে পুজো শুরু হয়ে যায়। বোধনের দিনই জ্বালানো হয় একটা প্রদীপ। যা জ্বলতে থাকে দমশীর হোম অবধি অর্থাৎ টানা সতেরো দিন। তাকে একবারও নিভতে দেওয়া হয়না। সপ্তমীতে তিনটি ছাগ, অষ্টমীতে এক রঙের (সাদা, কালো, ধলো) একটি ছাগ, নবমীতে ছয়টি ছাগ, একটি মেষ ও একটি মহিষ বলি করা হয়। এই জেলার লাভপুর সংলগ্ন শীতলগ্রামের যে পুজো সেখানে পৌরহিত্য করে বাজিকর সম্প্রদায়। এরা এক কালে খেলা (বাজি) দেখাত, রাজার গুপ্তচরবৃত্তি করতো। শীতলগ্রামের বাজিকর সম্প্রদায়ের মহিলাদের গাওয়া হাবু গান এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। তারই একটি উদাহরণ-

'ও জাগ জাগ্ জাগির ঘিনা
কলিকালে সবাই হলো তালকানা।
ও ঠাকুরণ শোনো শোনো এ-যুগেরই কতা
পাঁচ-ছ'টা বিটি হলে বাপের বুকে ব্যাথা।
ও জাগ জাগ্ জাগির ঘিনা...'

শীতলগ্রামের পুজোয় অসুর থাকেনা। সিংহের মুখ হয় নরসিংহের মতো। এখানের পুজোর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, অষ্টমীর পুজোতে চূড় করে রাখা সিঁদুরের উপর মায়ের নাকি পদচিহ্ন দেখা যায়। সেটি না দেখা গেলে পুজো শুরু হয়না। একদা জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়রও এই বিষয়টি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে আসে। সিঁদুরের উপর মায়ের পদচিহ্ন পড়ার রেওয়াজটি এখনও আছে আহমদপুরের দে'বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন পুজোয়। আবার মালো সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত পুজো হলো মাড়গ্রাম সংলগ্ন বসোয়া গ্রামের মালপাড়ার পুজো। মালো বা মালরা প্রতিমা তৈরী করে। পৌরহিত্যও করে। অন্তবায় সম্প্রদায়ও এই পুজোর পৌরহিত্যে অংশ নেয়। এখানে সরস্বতী কার্তিক লক্ষ্মী গণেশের মূর্তি থাকেনা। বদলে থাকে রাম লক্ষ্মণ হনুমান। বসোয়া গ্রামের পাশে বিষ্ণুপুরের গোপাল বাড়ির পুজো আটশো থেকে ন'শ বছরের পুরনো। এখানে সিংহের গায়ের রঙ সাদা। অসুরের গায়ের রঙ পঞ্জিকার বিবরণ অনুযায়ী সবুজ। সবুজ রঙের অসুর আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ আছে।

নানা বিবিধতা নিয়ে বীরভূমের দুর্গাপুজো। যা আজও হয়ে আসছে। আজও পার্থক্য থাকে মায়ের প্রতিমায়, পুজো পদ্ধতিতে, বলিদানে, ভোগ পরিবেশনে, লোকাচারে। দেবী কখনও জায়া রূপে পূজিতা। কখনও কন্যা। কখনও চর্তুভুজা, দ্বিভুজা। কখনও সপরিবারে থাকেন। কখনও এসে হাজির হয় রামচন্দ্র হনুমান বরুণদেব। আমরা যদি নলহাটির পাশে বানিওর গ্রামের পুজো দেখি সেখানে আছে এক লোকগাথা। কোনও এক কালে মা নাকি সন্ধে দেখাতে আসা এক গৃহবধূকে গিলে নিয়েছিল। সেই থেকে এখনও মাকে নাকি দড়ি বেঁধে রাখা হয়। আবার ইলামবাজারের দালাল পাড়ার পুজোয় আছে আরেক গল্প। একদা কার্তিক গণেশ কোকিলভোরে খেলা করছিল মন্দিরের সামনের চাতালে। মারুলি দিতে এসে তা দেখে ফেলে এক বুড়ি। বুড়িকে দেখে তারা দুই ভাই তাড়াতাড়ি বেদীতে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল করে বসে। গণেশ বসে কার্তিকের স্থানে। কার্তিক বসে গণেশের জায়গায়। সেই থেকে এই পুজোয় আজও মায়ের বামদিকে থাকে গণেশ। কার্তিক থাকে ডানদিকে। এখানের পুজোয় কলাবউকে বরণ করাটাও দেখার বিষয়। কলাবউকে সপ্ততীর্থের জল দিয়ে স্নান করানো হয়। কলাবউ রীতির বিপরীতে গিয়ে দুর্গার বাম দিকে অবস্থান করে। এখানে যে সন্ধিপুজো হয় তা আদতে চামুণ্ডার পুজো। তাছাড়া যুদ্ধ যাত্রায় যাওয়ার আগে, যুদ্ধে অপরাজিত থাকার জন্য আগে যেমন অপরাজিতার বালা ধারন করা হতো, এখনও সেই রেওয়াজ মেনে এখানে হয় অপরাজিতা বালার পুজো। অপরাজিতা পুজোর আরেক রূপ দেখা যায় মুরারই লাগা কনকপুর গ্রামে। সেখানে আছেন দেবী অপরাজিতা।

বীরভূমের পুজোর নানা ইতিহাস আছে। নানা রেওয়াজে উজ্জ্বল সেসব পুজো। কোথাও পুজো হয় পটে (গোপ্তা, লাভপুর, হাটসেরান্দি, বোলপুর)। কোথাও ঘটে (চাঁদপাড়া, রামপুরহাট)। কোথাও সিংহের বদলে থাকে নরসিংহ (কীর্ণাহার)। কোথাও কার্তিকের পাশে থাকে কলাবউ (চট্ট পারুলিয়া, ময়ূরেবর-১)। ১০০১ বঙ্গাব্দের প্রাচীন পুথি পাঠে কোথাও হয় পুজো (বেলেড়া, রাজনগর)। অষ্টমীতে তোপধ্বনি করে কোথাও মায়ের পুজো সম্পন্ন হয় (জয়দেব সংলগ্ন গড় জঙ্গল)।

নানা লোকবৈচিত্রে ভরপুর বীরভূমের লাল মাটি। নানা আয়োজনে ধর্মাচারের পীঠস্থান বীরভূম। এখানেই আছে পাঁচটি সতীপীঠ। আছে সিদ্ধপীঠ। নিত্যানন্দের জন্মভিটে। আছে পীরের দরগা, মারাংবুরুর আরাধনা। এখানে আছে কালো পাথর, সাদা খড়িমাটি, প্রাচীন টেরাকোটা মন্দির (ইলামবাজার, জয়দেব, গণপুর)। শতাব্দী প্রাচীন পাথরের মূর্তি (পাইকর, জাজিগ্রাম)। বীরভূমের গ্রামনামে আছে পুরানের গল্প। যেমন ভীমগড়া, যুধিষ্ঠিরপুর প্রভৃতি গ্রাম। আছে রাজা-মহারাজার স্মৃতিকথা (রাজা সুরথ, চেদিরাজ কর্ণদেব, পাল রাজ মহীপাল)। রাজবাড়ি-জমিদারবাড়ি (হেতমপুর, রাজনগর, সুরুল)। মন্দিরের গাত্রলেখ (ডাবুকেশ্বর মন্দির, ইটাণ্ডার মন্দির, ভাণ্ডীশ্বর শিব মন্দির, গণপুরের টেরাকোটা মন্দির)। বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকেও বীরভূম নিজের নাম স্থায়ী করে রেখেছে। চর্যাপদের লুই পা। লোচন দাস (কোগ্রাম), বনমালী দাস (সিউড়ি)। গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব। সঙ্গীত রচনায় অক্ষয় ঠাকুর, ছিরু ঠাকুর। পাঁচালিতে নদেরচাঁদ পাল। সাহিত্যকে আরও

(রাম লক্ষ্মণ হনুমানসহ দুর্গা : বজসায়া)

এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে- গুরুসদয় দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ, শিবরতন মিত্র, তারাশঙ্কর, ফাল্গুনী রায় প্রমুখ। এখানে আছে হিন্দু বৌদ্ধ ইসলাম। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ধর্ম মিলেমিশে একাকার বীরভূমের জীবনছন্দ। সুতরাং এহেন স্থানে দুর্গাপুজোর ব্যতিক্রম স্বাভাবিক।

পুরন্দরপুরের কাছে বেহিরা গ্রামে আবার দুর্গা প্রতিমা হয়না। অথচ দুর্গাপুজো ধুমধাম করেই হয়ে থাকে। ওই গ্রামে আছে নিম্নবাসিনী কালী। এই কালীকে মুনি ভরদ্বাজ প্রতিষ্ঠা করে। নিম্নবাসিনীকে মা দুর্গা রূপে পুজো করে বেহিরা গ্রামের মনুষজন। রাজনগরের পাশে বেলেড়া গ্রাম। এখানের দুর্গাপুজোয় কোনও ছাপানো বই পাঠ করে পুজো হয়না। বলরাম বাচস্পতি বলে এক ব্যক্তি কয়েক শতাব্দী আগে লিখেছিলেন পুজো পদ্ধতি ও মন্ত্র। সেই পুথি পাঠ করে এখনও এই গ্রামে দুর্গা পুজো হয়। বলা হয় নবমীর দিন এই মায়ের চোখ দিয়ে নাকি সত্যি সত্যি জল গড়ায়। আবার লাভপুর লাগোয়া মহোদরী গ্রামে গামলায় জল নিয়ে তামি পেতে ঠিক করা হয় সন্ধিপুজোর দিন-ক্ষণ। পুজো হয় পটে। যা আসে পাশের গ্রাম পুণ্য থেকে। লাভপুর ঘেঁষা গোপ্তা, হাটসেরান্দি, রায়পুর প্রভৃতি গ্রামেও পটে পুজো হয়। আবার হেতমপুরের ঈশান মুন্সির বাড়ির পুজো প্রায় ৩৫০ বছর পুরনো পটের পুজো। এখানে অদ্ভুত একটা ভোগ প্রস্তুত করা হয়। মায়ের ভোগে দেওয়া হয় হলুদ মুড়ি, ৮ রকমের কলাই ভাজা, আদা কুচি। অন্যদিকে কোমা গ্রামের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় প্রচলিত হাজরা বাড়ির পুজোও কয়েক শতাব্দী প্রাচীন পটের পুজো। জলন্দীর পটের দুর্গাপুজো আবার শুরু হয়ে যায় ষষ্ঠীর বারো দিন আগে থেকে। বালিজুড়ি গ্রামেও এই রেওয়াজ।

নানা দিকে নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বীরভূমের দুর্গাপুজো অন্যমাত্রা এনে দেয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাখে লোকজ স্বাদ। লোকাচারের দর্পণে পুজো পায় আলাদা মাহাত্ম্য। মানুষের বিশ্বাসে, ভক্তির অঞ্জলিতে, দর্শনার্থীর ভীড়ে মেতে ওঠে বীরভূম। পুজো হয় ঘটে। পুজো হয় পটে। নবপত্রিকার পুজো হয় অন্যত্র। যেমন ফতেপুরের ব্যানার্জী পাড়ার নবপত্রিকা পুজো। তারাপীঠ সংলগ্ন কড়কড়িয়া গ্রামের রায় পাড়ার পুজো হয় নবপত্রিকায়। মল্লারপুরের বিশ্বাস বাড়ির পুজোও নবপত্রিকার। এই পুজোতে দুর্গার সঙ্গে থাকে জয়-বিজয়া। অন্যদিকে বোলপুর লাগা সুরুল রাজবাড়ির পুজোতে ঢাক বাজার রীতি নেই। সেখানে বাজানো হয় ঢোল। সেখানে বিসর্জনের দিন এক ফোঁটা বৃষ্টি হলেই বন্ধ হয় প্রতিমা নিরঞ্জন। সুরুল বাড়িতেও দেখা যায় অপরাজিতা পুজো, অপরাজিতার বালা ধারণ। নানা রীতির নানা ইতিহাস নিয়ে বীরভূম। সেখানে থাকে গল্প। যেমন-কুরুমগ্রাম লাগেয়া বুজুং গ্রামে বোলতলা পাড়ার দুর্গাপুজোর গল্প। এখানে আগে মায়ের হাত দশটিই হতো। কিন্তু ১৯৯১ সালের বন্যায় মায়ের কাঠের পাটাতন যায় ভেসে। বুজুং গ্রামের চক্রবর্তী ও চ্যাটার্জী পরিবার মায়ের পুজোকে বহরমপুরে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কারিগরকে মা দেয় স্বপ্নাদেশ। ততদিনে পুজোর সময় চলে এসেছে। হাতে সময় নেই। দ্রুত প্রতিমা তৈরীর জন্য তখন মায়ের দুটি হাত বড়ো রেখে, বাকি আটটি হাতকে ছোট করে সময়ে পুজো শুরু করা হয়। সেই থেকে এই মায়ের দুটি হাত দীর্ঘ। বাকি আটটি হাত অতিক্ষুদ্র। এখানে গণেশেরও দুটি হাত। যা অন্যত্র দেখা যায় না। মা অসুর বধের দৃশ্য ধরে না। এই পুজোর আরেক দুর্লভ বিষয় হলো, বিসর্জন করার সময় মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্য জায়গায় বৃহস্পতিবার বিসর্জন বন্ধ থাকলেও এখানে বৃহস্পতিবারও নিরঞ্জন করা হয়। বীরভূমের দুর্গাপুজোয় সব চেয়ে বেশি প্রতিমা থাকে কোয়েম্বা গ্রামে। সেখানে আঠারো জনের অবয়ব থাকে, যাকে গ্রামীণ ভাষায় আঠারো পুতলার পুজো বলা হয়। নানা স্থানে নানা বিষয়। নানা কাণ্ড। নানা আয়োজন। যেমন সিউড়ির বসাক বাড়ির দুর্গাপুজো। এখানে পুজো শুরু হয় মনসা পুজো দিয়ে। চারকোল গ্রামে প্রায় তিরিশটির মতো প্রতিমা হয়। এখানে আছে হিন্দু-মুসলমানের অটুট সম্প্রীতি। গদাধরপুরের কাছে চট্ট পারুলিয়া গ্রামে হয় মোষ বলি। কলাবউ গণেশের কাছে না থেকে কার্তিকের পাশে থাকে। আবার রামপুরহাট শহরের মণ্ডল বাড়ির পুজোয় বলিদানের বিশেষ ধরন দেখা যায়। এই পুজো পাঁচশো বছরের অধিক প্রাচীন। এখানে তাস-আলতা ও মাসভক্তবলি হয়। তাস-আলতা হলো তুলোর উপর আলতা ঢেলে বলি। আবার মাসভক্ত হলো মাসকলাই-এর বলিদান। বীরভূমের আনাচ-কানাচে এমন সব পুজো আছে যা আরও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। তাই বীরভূমের পুজো দেখতে এলে ‘রথ দেখা কলা বেচা’ দুটোই হবে। ব্যতিক্রমকে চাক্ষুস করার পাশাপাশি কাগজ-কলমে নোট করাও যাবে। ভিডিও বানানো যাবে।

গল্প

ঝোটনের ভাগ্য বলিহারী

সীমা ব্যানার্জ্জী-রায়
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মশাগ্রামের কনকনে শীতের দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ক্রিকেট ম্যাচ চলছে প্রতিদিন। জিত, অচ্যুত, প্রিন্স, সোমদের এটাই এখন রোজকার রুটিন। এ্যনুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। রেজাল্ট আউট হয়ে গেলে সেই তো আবার নতুন ক্লাস শুরু। নাইন থেকে ক্লাস টেন হবে ওদের। ক্রিকেট খেলা শেষে আজ খেলার মাঠে গোল হয়ে বসেছে ওরা সবাই। মাথা গুণে দেখা গেল ওরা এগারো জন।
প্রিন্সই কথাটা তুলল। "বন্ধুগণ, রবিবার ফিস্টি করলে কেমন হয়?
"আবহাওয়া খুব ভালো থাকবে-বলছে আবহাওয়া দপ্তর।"
ফিস্টির নাম শুনে একবাক্যে সকলেই হাত তুলে বলল, "হোক হোক। অনেক দিন কিন্তু ফিস্টি হয়নি।"
সোম বলল, "মেনু কী হবে সেটা তো আগে ঠিক কর।"
"মাংসের ঝোল, ভাত আর চাটনি।" প্রিন্স প্রস্তাব দিল।
সকলেই বলল, "এটাই ঠিক আছে, একদম ফাইনাল।"
সন্ধ্যেতেই দল বেঁধে চলে গেল গ্রামের কাদরী কাকুদের বাড়ি। কাদরীকাকুর ছোট্ট একটা ফার্ম আছে। একসঙ্গে এতজনকে দেখেই বুঝতে পেরে কাদরীকাকু বলল,
"ফিস্টি আছে নাকি রে? দিশি মোরগ চলবে?"
মাথায় লাল ঝোটন ওয়ালা মোরগটা দেখিয়ে বলল," এটা তিন কেজির ওপর ওজন আছে। পারলে আজই নিয়ে চলে যা। পরে এলে আর পাবি না।"
আজ সবে বুধবার। রবিবার আসতে অনেক দেরী। রবিবার মাংস লাগবে সেটাই কাদরী কাকুকে জানাতে এসেছিল। সোম বলল, "ভাই আজই নিয়ে চলে চল। রবিবার আবার পাব কি না পাব? বুঝতেই পারছিস এটা দিশি মোরগ।"
কথাটা শুনে কাকু নিজেই বলল, "টাকা নিয়ে ভাবছিস নাকি? তোরা পাড়ার ছেলে। চাঁদা তুলে রবিবারই আমাকে টাকাটা দিস।"
কাকু এমন সমাধান দিতেই সকলেই খুশী হয়ে গেল। লাল ঝোটনওয়ালা মোরগটা কাকুর বাড়ি থেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর তৈরি হলো আসল সমস্যাটা। প্রিন্স বলল, 'আজ সবে বুধবার। এখনও তিনটে দিন। নিয়ে তো নিলাম, কিন্তু মোরগটাকে রাখব কোথায়?'
গুরুতর সমস্যা। সত্যিই তো মোরগটা থাকবে কোথায়? কেউই নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে রাজী নয়। এ বলে তোর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখ, ও বলে তোর বাড়িতে। তুইথুলি মুইথুলি লেগে গেল। প্রিন্স শেষমেষ বলে উঠল, "ছাড়! তোদের কারো বাড়িতেই নিয়ে যেতে হবে না, আমাকে দে আমার বাড়িতেই নিয়ে গিয়ে রাখি। খুশি তো?"
মোরগটাকে একটা ব্যাগের মধ্যে পুরে চুপি চুপি বাড়ি ফিরল প্রিন্স। চুপি চুপি বাড়ি ফেরার কারণটা হলো বাবা। কোনো উটকো ঝামেলা বাবা পছন্দ করেন না। তবে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে মা। প্রিন্স রান্না ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই মৃদু স্বরে ডাক দিল,

"মা, ও মা একটু বাইরে আসবে?"
গ্যাসের উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন মা। ছেলের গলার আওয়াজ পেয়ে মা বললেন, "আমার এখন হাত জোড়া। কিছু বলছিস? ভিতরে এসে বলে যা।"
মোরগটাকে নিয়ে রান্না ঘরে ঢোকা ভালো দেখায় না। ঠাকুমা জানতে পারলে চিল্লে বাড়ি মাথায় করবে। প্রিন্স বলল, "তুমি বাইরে এসো একবার, দরকার আছে।"
একটু বিরক্ত হয়ে মা গ্যাস উনুন নিভিয়ে শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বাইরে এসে বললেন,"দেখতে পাচ্ছিস মা কাজ করছে একটা। আর এদিকে মা মা করে চিৎকার করছিস। বল এবার, ডাকছিলি কেন?"
"প্রিন্স এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল,"আস্তে কথা বলো। বাবা যেন শুনতে না পায়।"
ছেলের এমন কথায় সন্দিহান চোখে প্রিন্সের হাতে বড়ো ব্যাগটার মধ্যে কী একটা নড়ে চড়ে উঠতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাগে কী আছে রে?"
"মোরগ!"
মোরগ শুনে মায়ের মেজাজ গেল বিগড়ে। "মোরগ মানে? এই সন্ধ্যে বেলায় মোরগ কোথা থেকে নিয়ে এলি? আর মোরগ নিয়ে হবেটাই বা কী?"
"আরে আস্তে কথা বলো, সব বলছি আমি। রবিবার বন্ধুরা মিলে ফিস্টি করব। তাই আজ কাদরী কাকুর থেকে কিনে নিয়ে চলে এসেছি। কোথাও রাখার জায়গা হচ্ছিল না বলে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি। তিন দিন আমাদের বাড়িতেই থাকবে।"
"আমাদের বাড়িতে থাকবে মানে? এ কি কুটুম এসেছে যে বাড়িতে থাকবে? ওসব ঝামেলা আমি নিতে পারব না এই আমি বলে দিলাম। যেখান থেকে নিয়ে এসেছিস সেখানেই দিয়ে আয়। আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না, বুঝলি?"
মায়ের এমন চিৎকারে বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, সঙ্গে ঠাকুমাও।

" কী হলো আবার! এত চিৎকার কিসের?" বাবার এমন কথায় উত্তর দিয়ে মা বলে, "তোমার ছেলেকেই জিজ্ঞেস করো!" কথাটা বলেই মা গড়গড় করে ছেলের মোরগ আনার কাহিনী নিজেই জানিয়ে দিলেন। সব শুনে বাবা শান্ত মেজাজে বল্লেন, "এনেই যখন ফেলেছে, তখন একটা তো ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় রাখা যায় সেটা ভাবো।"

ঠাকুমাও নাতির এমন কর্মকাণ্ড দেখে উপায় বাতলে দেন। ছেলেকে বলে, "হ্যাঁ রে সুদীপ, আমাদের পুরানো একটা খাঁচা গোডাউন ঘরে পড়ে আছে তো। তা ওটাই বের করে এনে দে। দু তিন দিনের ব্যাপার তো। তারপর তো আর থাকবে না।"
বাবাও সঙ্গে সঙ্গে গোডাউন ঘর থেকে বড়ো পুরানো খাঁচাটা বের করে নিয়ে আস্েন। খাঁচাটা এক সময়ে ব্যবহার হতো। কিছু পোষা টিয়া ওর মধ্যে থাকত। সেই খাঁচাটাই অযত্নে গোডাউন ঘরে পড়েছিল এতদিন। খাঁচাটা বের করে নিয়ে আসতেই ব্যাগ থেকে লাল ঝোটন ওয়ালা মোরগটাকে বের করে খাঁচায় পুরে দেয় প্রিন্স। বাবা আর ঠাকুমাকে নিয়ে যে ভয়টা করছিল, সেই ভয়টা চলে যেতেই প্রিন্স বলল, "দেখলে মা! তুমি অহেতুক চেঁচামেচি করছিলে।" বাবা তখন বলে উঠলেন,
"খাঁচায় পুরে দিলেই তো হবে না। তোর ওই ঝোটনকে খেতেও দিতে হবে, সেটা যেন মনে থাকে।"

ঠাকুমা পাশ থেকে ছেলেকে বললেন, "তুই তো আবার ওর একটা নামও দিয়ে দিলি। তবে ঝোটন নামটা বেশ খাসা।"
রবিবার। সকাল থেকেই চলছে তোড়জোড়। আজ ফিস্টি। প্রিন্সদের পুকুর পাড়ে নারকেল গাছের তলায় একটা ডাঙা আছে, ওখানেই চলছে আয়োজন। মেনুতে ভাত, বেগুন ভাজা, দিশি মাংসের ঝোল, আর চাটনি। জিত, সোম সহ আরো দুজন গেছে বাজারে। অন্যরা ইঁট পেতে উনুন তৈরি করছে, কেউ আবার এদিক ওদিক থেকে কাঠের জোগাড় করছে। এদিকে গত রাত থেকেই প্রিন্সের মনটা ভীষণ খারাপ। বাজার সেরে জিত সোম আসবে ঝোটনকে নিয়ে যেতে। প্রিন্সের মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। শুধু প্রিন্সের নয়, মন খারাপ প্রিন্স এর মা, বাবা, ঠাকুমারও। তিন দিন ধরে প্রিন্স যেভাবে যত্ন করে ঝোটনকে খাইয়েছে, দেখাশোনা করেছে, ঝোটনের পরিণতির কথা ভেবে চোখে জল এসে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই বন্ধুরা আসবে ঝোটনকে নিতে। প্রিন্সের যেন ইচ্ছেই নেই ঝোটনকে বিদায় দিতে। প্রিন্সের এই অন্যমনা ভাবটা লক্ষ্য করেছেন প্রিন্সের বাবাও। বুঝতে পারছেন, প্রিন্স এই তিন দিনেই একটা মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে। প্রিন্সকে ডেকে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে তোদের পিকনিকের মেনুতে মাংস ছাড়া আর অন্য কিছু থাকছে না? "

প্রিন্স বলে, "মাংসের ঝোল আর ভাত এটাই তো মেনু। বাজার করাও তো হয়ে গেছে। অন্য কিছু বললে ওরা মনে হয় আর রাজীও হবে না। কথাটা বলেই কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রিন্স বলল,

"কিন্তু বাবা, ঝোটনকে ছাড়তে কিছুতেই মন চাইছে না।" বাবাও যেন প্রিন্সের সাথে সমব্যথী। খাঁচার লকটা ভেঙে গিয়েছিল, সেটা নিজে হাতেই সারিয়ে দিয়েছিলেন, উটকো ঝামেলা ভাবলে বাবা হয়তো সারাতে যেতেন না। এখন আর উপায় কি! ঝোটনকে বিদায় দিতে যেন কারোরই ইচ্ছে নেই। বাবারও মনটা একটু খারাপ। এদিকে বাবার সাথে কথা বলতে বলতেই প্রিন্সের বন্ধুরা চলে আসে তাকে ডাকতে, সঙ্গে ঝোটনকেও নিয়ে যাবে। সকলকে একসঙ্গে দেখে প্রিন্সের বাবা কী একটা যেন ভেবে নিয়ে বলে ওঠেন, "তোমরা যখন সবাই আছো, একটা কথা আমি বলতে চাই। পিকনিকটা যেহেতু আমাদের পুকুরের ডাঙাতেই হচ্ছে, তাই আজকের পিকনিকের যা খরচ হবে, তার পুরোটাই আমি দেব। তোমাদের কারোরই কোনো চাঁদা দেওয়ার দরকার নেই। এতে কি তোমাদের কারো অসুবিধা আছে?"

এতো বড়ো অফার কেউ কখনো হাত ছাড়া করে? জিত অবাক হয়ে বলল, "কাকু তুমি খরচ দেবে সব? তাহলে তো বিশাল ব্যাপার। তবে আমাদের একটা শর্ত আছে। তুমিও খাওয়া দাওয়া করবে আমাদের সাথে, মানে আমাদের ফিস্টে তোমাকেও থাকতে হবে।"

"-সে তো করতেই পারি! তোমাদের যা মেনু, ও তো আমি খাই না বাবা। তার ওপর আবার দিশি চিকেন? তোমরা কি আর আমার জন্য মেনু চেঞ্জ করবে? ও অসুবিধা নেই। তোমরা খেলেই আমি খুশী।"
সোম বলল," না কাকু। তোমার পছন্দের মেনুতে আমরাও রাজী। বলো তুমি কি মেনু ভাবছ? গাইস, তোমরা কি বলো? কাকু যা মেনু বলবে তাতে সবাই রাজী তো?"
সমস্বরে বলে উঠলো, " হুররে! রাজী ইইইইইই।"

"তাহলে মাছ আর ডিম দুটোই থাকুক না। আরো একবার বাজার যেতে হবে। সে না হয় আমিই যাচ্ছি। বড়ো সাইজের ভেটকি পেলে মন্দ হবে না? তোমরা কী বলো?"
ভেটকির নাম শুনে এক বাক্যে সকলেই বলে উঠল, তাহলে " ইয়ে! ভেটকিই হোক।"

পাশ থেকে অচ্যুত বলল, "তাহলে এই দিশি মোরগটার কী হবে? কাদরী কাকুকে মোরগের দামটাও তো দেওয়া হয়নি। ফেরত দিয়ে আসা হোক বরং, ফেরত দিলে কাদরীকাকু নিয়েও নেবে। কি বলো কাকু?"

কাকু মানে প্রিন্সের বাবা বললেন, "ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। ও যখন আমাদের বাড়িতে এসেই পড়েছে, ও বরং আমাদের অতিথি হিসেবেই থেকে যাক। টাকা আমি মিটিয়ে দেব। আজ থেকে ঝোটন আমাদের সকলের বন্ধু।"
"থ্রী চিয়ার্স ফর গ্রেট কা...কু...উ...উ...ইয়ে দোস্তি হম নেহি ছোড়েঙ্গে..."

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Announcement, NABC 2027

— MESSAGE FROM THE CONVENER

47TH NORTH AMERICAN BENGALI CONFERENCE

Bengal Soul, Silicon Mind

— BRIDGING TRADITION & INNOVATION

ঐতিহ্যের আলোয় প্রযুক্তির মেলা— বাংলা ও সিলিকন ভ্যালির সেতুবন্ধন।

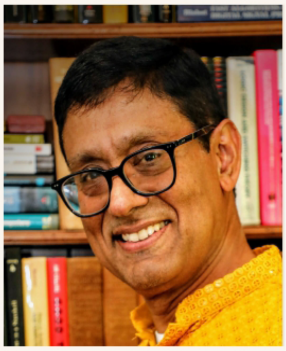

Prith Banerjee

CONVENER, NABC 2027

Dear Friends,

It is an honor to welcome you, on behalf of the Organization of West Coast Bengali Associations, to the **47th North American Bengali Conference — NABC 2027** — to be held July 2–4, 2027, in the San Francisco Bay Area.

For more than four decades, Banga Sammelan has given our community a place to come together through music, dance, theatre, literature, cinema, food, friendship and memories. In 2027, NABC returns to the Bay Area for the **fifth time**, following 1987, 1999, 2009 and 2017. It is humbling to carry that legacy forward.

This year is deeply meaningful because, **for the first time, many Bengali associations across the West Coast are joining hands to host this gathering under the banner of the Organization of West Coast Bengali Associations.** That spirit of collaboration is at the heart of NABC 2027.

Our theme, **"Bengal Soul, Silicon Mind: Bridging Tradition & Innovation,"** reflects that aspiration — to remain rooted in the culture we cherish while embracing the ideas, creativity and possibilities that define Silicon Valley.

Across three days, we aim to create something for every generation: music, dance and theatre; literature and films; alumni reunions and NextGen events; culinary experiences; exhibits, jewelry and marketplace offerings; and conversations across business, technology and innovation.

A special highlight of NABC 2027 will be the **World AI Symposium**, bringing together researchers, technologists, entrepreneurs, academics and industry leaders to explore the fast-changing world of Artificial Intelligence and build new links between Silicon Valley, North America and Bengal. Learn more at **worldaisymposium.org**.

But NABC is ultimately about people — the friendships we renew, the traditions we pass on, the relationships we form, and the volunteers who give their time and heart to make this gathering possible. I am grateful to everyone already working behind the scenes and to all who will join us in the months ahead.

Registration for NABC 2027 is now open at nabc2027.org. We will continue to share artists, speakers, programs and new announcements through *Sangbad Bichitra* and our website.

I hope you will join us next July — to celebrate our heritage, discover new ideas, reconnect with old friends and create memories together with your families.

Prith Banerjee

CONVENER, NABC 2027

ORGANIZATION OF WEST COAST BENGALI ASSOCIATIONS

JULY 2–4, 2027 | SAN FRANCISCO BAY AREA

WHAT TO EXPECT

JULY 2–4, 2027

Three days. A world of experiences.

CULTURE. CONNECTION. IDEAS. COMMUNITY.

Music, Dance & Theatre

Classical traditions, contemporary concerts, dance, theatre and major stage productions.

Literature, Cinema & Visual Arts

Author conversations, poetry, film, artist interactions and exhibitions across multiple media.

Friends, Alumni & NextGen

Reconnect with friends and alumni while students and young adults build new connections through gatherings, workshops and networking.

FEATURED

World AI Symposium 2027

SILICON VALLEY · NORTH AMERICA · BENGAL

A global gathering of technologists, researchers, entrepreneurs, academics and industry leaders exploring the rapidly evolving world of Artificial Intelligence.

WORLDAISYMPOSIUM.ORG

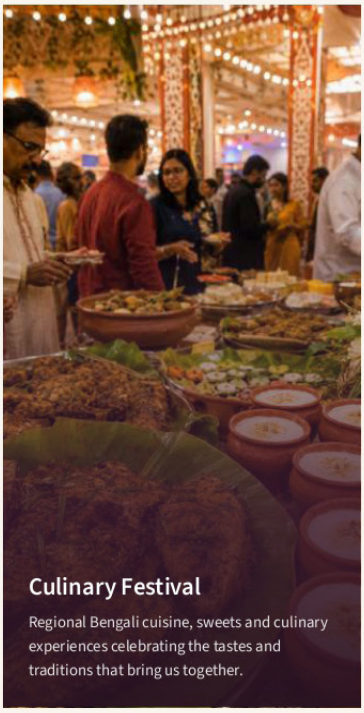

Culinary Festival

Regional Bengali cuisine, sweets and culinary experiences celebrating the tastes and traditions that bring us together.

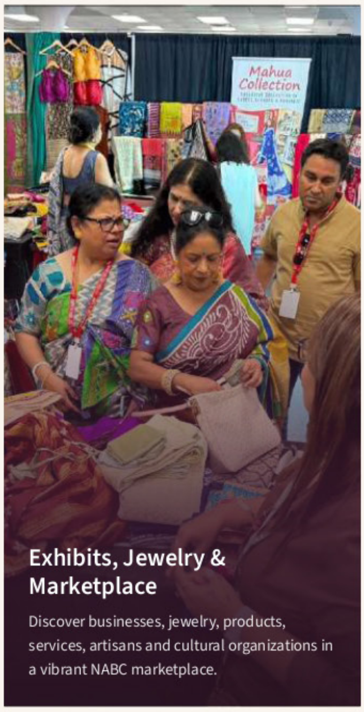

Exhibits, Jewelry & Marketplace

Discover businesses, jewelry, products, services, artisans and cultural organizations in a vibrant NABC marketplace.

BENGAL SOUL, SILICON MIND · BRIDGING TRADITION & INNOVATION